লীনা পারভীন

নিজেকে চিনতে শিখো নারী

আমাদের সমাজে বেশিরভাগ নারীরাই নিজের সম্পর্কে অচেতন। এককথায় নিজেকেই নিজে চিনে না বা চিনতেও চায় না। জানার প্রয়োজনতো অনেক দূরের বিষয়। চিনা ও জানার মধ্যে একটা সূক্ষ্ম পার্থক্য আছে। বেশিরভাগ বললেও বাস্তবে প্রায় সব নারীই নিজের চাওয়া পাওয়া সম্পর্কে অজ্ঞতায় বাস করে।

এর কারণ কী হতে পারে? এই প্রশ্নটা যদি করা হয় কোন পুরুষকে তবে উত্তর কেমন আসতে পারে? একদম সঠিক ভেবেছেন। বেশিরভাগের সিদ্ধান্তই আসবে নারীর আবার চাওয়া পাওয়া কী? একজন নারী সংসারে থাকে, সংসারের সবার ভালোমন্দ দেখভাল করাইতো তার মুখ্য চাওয়া। এর বাইরে আবার কী হবে? আপাত আধুনিক পুরুষেরা কিছুক্ষণ সময় নিবে। ভাবতে থাকবে কী বলা যায় উত্তরে? খুব সচেতনভাবে উত্তরটি দিতে হবে। তবে সঠিক উত্তরটি খুঁজে পাবেন না তারাও। অনেকেই হয়তো বলবেন, এর উত্তর একজন নারী ভালো দিতে পারবেন। অন্যের চাওয়া আমি কেমন করে বলতে পারি?

নারী

এবার যদি একই প্রশ্ন আমাদের নারীদেরকে করা হয়? এখানেও নারীরা সময় নিবে অনেকক্ষণ। ভাবছেন কেন? প্রিয় পাঠক, লেখাটি পড়ার সময় মাথায় রাখতে হবে বাংলার সকল নারীর কাহিনিকে। বস্তুত, বেশিরভাগ নারীরা যারা গ্রামে বাস করেন এবং নিজে কোন প্রকার অর্থনৈতিক কর্মের সাথে জড়িত নন তাদের কথাই ভাবতে হবে। অবশ্য, গ্রামের নারীদেরকেই বা কেন বলছি? শহুরে কর্মজীবী নারীদের চিত্রও কি খুব আলাদা কিছু? এখনও আমাদের বিজ্ঞাপন, সিনেমা বা নাটকের ভাষায় প্রকাশ পায় নারী একদিকে অফিসে কাজ করছেন, আবার পরিবারের সবার জন্য খাদ্য প্রস্তুত থেকে শুরু করে সন্তানের স্কুলের বিষয় সবকিছুকেই সামলাচ্ছেন। তার মানে একজন নারী তিনি যত বড় পদেই কাজ করেন না কেন তাকে পরিবারের সবার সুখ শান্তির কথা ভুলে গেলে চলবে না। একজন নারীকে দুর্গার সমান শক্তিমান হতে হবে। এতসব করার পর যদি সময় থাকে তবেই সেই নারীকে নিজেকে নিয়ে ভাবতে হবে। তবে প্রশ্ন হচ্ছে, এতকিছু যিনি করছেন তাকে নিয়ে পরিবারের অন্যদের চিন্তা ভাবনার কোন প্রকাশ কিন্তু কোথাও দেখানো হচ্ছে না।

আজকাল এই ডিজিটাল যুগে এসে অন্যদেরকে 'মোটিভেশন' দেয়া বা উদ্দীপিত করে রাখা বা সরল কথায় প্রেরণা দেয়াটাও কিছু লোকের পেশা হিসেবে দাঁড়িয়ে গেছে। আমি বলছি না সেসবের মধ্যে খারাপ কিছু আছে কিন্তু খুব ভালোর কি কিছু আছে? সেসব বক্তৃতা শুনে কজন লোকের জীবনে কতটা পরিবর্তন এসেছে তার হিসাব নেয়া হয়নি বলেই আসলে এর সম্পর্কে সফল বা বিফল কোন মন্তব্য করা যাচ্ছে না।

যদি প্রশ্ন করা হয় আমাদের সমাজের সবচেয়ে অবহেলিত ও ডি-মোটিভেটেড গ্রুপের মানুষ কারা? আমার মতে উত্তর হওয়া উচিত নারীরা। প্রশ্ন আসতেই পারে, কেন? নারীরাতো বেশ আনন্দ ফূর্তিতে বেঁচে আছে। খাচ্ছে দাচ্ছে দিন পার করছে। কিন্তু আসলেই কী তাই? আমাদের সমাজের কয়জন নারী জানেন জীবনের সুখ আসলে কাকে বলে? আনন্দ কাকে বলে বা কেমন করে আনন্দকে নিজের করে নিতে হয়? কেন জানে না সেই উত্তর খুঁজতে গেলেই দেখা যাবে আমাদের সমাজে একজন নারী জন্মের পর থেকেই শিখছে নারী হিসেবে সমাজ তাকে কী কী করার অনুমতি দিয়েছে আর দেয়নি। এই যে 'সমাজ' কর্তৃক দেয়া বা না দেয়ার বিষয়টি খেয়াল করে দেখেন এই টার্মটি সর্বনাশ করে দিচ্ছে একজন মানুষের স্বতন্ত্র চিন্তার জায়গাটিকে। তাই বলে কি একজন নারীর অভ্যন্তরে নিজের মতো করে ভাবার, বেঁচে থাকার, সময়কে উপভোগ করার সর্বোপরি জীবনকে নিজের মতো চিনতে ও জানতে এবং উপভোগ করতে বাসনা জন্ম নেয় না? অবশ্যই নেয়। নারী সেতো বায়োলজিক্যালি নারী আর তার নারীসত্ত্বাকে কেন্দ্র করে যা যা রীতিনীতি সবইতো সমাজের সৃষ্টি। আর বায়োলজিক্যাল চাহিদা প্রতিটা মানুষের সমান। একজন পুরুষের যেমন ক্ষুদা লাগে, জিহবার স্বাদ অনুযায়ী খেতে ইচ্ছে জাগে, মনের চাহিদা মিটাতে সমুদ্রে বা পাহাড়ে ঘুরতে ইচ্ছা করে ঠিক একই চাহিদা একজন নারীর মনেও জাগে। পার্থক্য কোথায় জানেন? পার্থক্য হচ্ছে প্রকাশের সুযোগে। পুরুষ তার মনের ইচ্ছাকে প্রকাশ করে অবলীলায় আর নারীরা পারে না সামাজিক কারণে।

'সমাজ' বলতে এখানে আমাদের চারপাশকেই বুঝানো হয়েছে যেখানে আছে আমাদের পরিবার থেকে শুরু করে আশপাশে অবস্থান করা সবাই। কিন্তু এই সমাজকে আবার কখনই একজন নারীর প্রয়োজনে পাওয়া যায় না। নির্যাতিত হবার সময়ে সেই সমাজ এগিয়ে আসবে না আটকাতে বরং উলটো খুঁজতে থাকবে কেন নির্যাতন করা হচ্ছে। নিশ্চয়ই নারীর কোন আচরণ এখানে 'উদ্দীপক' হিসেবে কাজ করেছি। অর্থাৎ, একজন মানুষকে বেআইনিভাবে নির্যাতন করা হচ্ছে সেটি কোন মুখ্য বিষয় নয়। প্রতিটা মানুষের জন্ম হয় এ পৃথিবীকে উপভোগ করার জন্য। পৃথিবীর আনাচে কানাচে লুকিয়ে থাকা সৌন্দর্যকে যদি একজন মানুষ নিজের মতো করে উপভোগই না করতে পারলো তবে আর জন্মের স্বার্থকতা কোথায়? অথচ নারীদের যেন জন্মের স্বার্থকতা খুঁজতে নেই। কেন? নারীরা কি তবে এই ব্রহ্মাণ্ডের কেউ নয়? তারা কি এলিয়েন? নয়তো। তারাও এই পৃথিবীতেই জন্ম নেয়া, একই জল, বায়ু, পানি ভোগ করে বেড়ে উঠা প্রাণী।

এই সমাজে রুমানা মনজুরের মতো উচ্চশিক্ষিত ও আধুনিক মনসম্পন্ন একজন নারীকেও চোখ হারাতে হয় 'স্বামী' পদ ধারী একজন পুরুষের হাতে। অথচ রুমানার কিছুই অভাব ছিল না। বরং সেই স্বামীটির গর্ব করার মতো ছিল অনেক কিছু। স্ত্রীর অর্জনে গর্বিত হওয়াটাও যেন আমাদের এই পুরুষতান্ত্রিক সমাজে বেড়ে উঠা পুরুষদের জন্য অবমাননাকর।

জীবনের প্রতিটি স্তরেই তাই নারীকে পার করতে হয় হরেক পদের বিপত্তি। যেহেতু বিপত্তির কোনো শেষ নাই তাই নারীদের প্রতি আমার অনুরোধ, বোনেরা, আসুন আমরা আমাদের জীবনকে নিজের মতো করে সাজাই। আমার জীবনের মালিকানা কারও নয় বরং আমি নিজেই।

জানি এ কথা শুনে অনেকেই কেঁপে উঠবেন। পুরুষেরা কেউ কেউ তেড়ে আসবেন আবার কেউ কেউ ভিতরে ভিতরে ফুঁসে উঠবেন। আমাদের নারীরাও অনেকেই মানতে নারাজ এই মালিকানা তত্ত্বকে। এটি তাদের অবশ্য দোষও নয়। জন্মের পর একজন নারীর পরিচয় শুরুই হয় অন্যের লেজ ধরে। পরিচিতিমূলক একটি নাম রাখা হলেও পরিচিত হয় কারও কন্যা হিসেবে।

বিয়ের পর যুক্ত হয় আরও নানা পদের পরিচিতি। একজন স্বামীর যোগ্য স্ত্রী হয়ে উঠার চ্যালেঞ্জ যেমন আছে তেমনি আছে শ্বশুরবাড়ির মুখ রক্ষার একমাত্র বাহক। যেন এর আগে এই বাড়িটির মান সম্মান ছিল না কখনও। তাই ওমুক বাড়ির বউ হতে হলে এমন করে চলতে হবে, তেমন করে বলতে হবে। সবার মন জুগিয়ে চলাটা ফরজের তালিকায় যুক্ত হয়। সবার খাওয়া শেষ হলে পরে খেতে হবে কারণ বাড়ির বউ আগেই ভালোটা নিজে খেয়ে নিতে নেই। ননদ দেবর হাঁটুর সমান বয়সী হলেও ভাবিকে তাদেরকেও তোয়াজ করে চলতে হবে। নামের পাশে তখন বাবার টাইটেলের জায়গায় স্থান করে নেয় স্বামীর টাইটেল। বাহ!! নানা সামাজিক আয়োজনে পরিচিত হয়ে যায় অমুক ভাবি হিসেবে বা মিসেস অমুক। দিনে দিনে সেই নারীটি নিজেই ভুলতে বসে বাবা মায়ের দেয়া নামটা কী ছিল।

এই জায়গা থেকে বেড়িয়ে আসার সময় হয়েছে নারীদের। নিজের পরিচয় নিজেকেই তৈরি করতে হবে। কারও নামের লেজ টানিয়ে কেউ আত্মপরিচয় দাঁড় করাতে পারে না। নিজের কাছে নিজে শপথ নিতে হবে আমি আর যাই করি না কেন নিজের স্বপ্নগুলোকে মরতে দিব না। যা করতে চাই, যা করতে চেয়েছিলাম সব করবো এবং তা নিজের স্বামর্থেই। এমনকি ব্যররথও যদি হই তবে কারণগুলো সম্পর্কে নিজের কাছে পরিষ্কার থাকব। সবার আগে প্রয়োজন নিজেকে কেমন করে দেখতে চাই, এই বিষয়টিকে সংজ্ঞায়িত করা। আত্মপরিচয়ের জায়গাটি যদি নিজের কাছে পরিষ্কার থাকে তবে সে অনুযায়ী ছক কষাটাও নিজেকেই করতে হবে। মনে রাখতে হবে, এই জায়গাটিতে কেউ সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দিবে না সে যত আপনজনই হোক না কেন।

ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা থেকে বলতে পারি, ছেলে চেয়ে মেয়ে পেয়েছিল আমার পিতা মাতা। সামাজিক বাস্তবতা তাই আমার ক্ষেত্রে ভিন্ন কিছু ছিল না। ছোটবেলা থেকেই বুঝেছিলাম এই সমাজ একজন মেয়ে হয়ে জন্মানো মানুষটাকে কতটা অনাকাঙ্ক্ষিত করে দেয়। জীবনের চাওয়া পাওয়ার তালিকাটাও তাই বাড়তেই দেইনি আমি তবে মরে যেতে দেইনি কখনই। এখনও দেইনি। কেবল প্রস্তুত করতে চাই নিজেকে যেন আমার লালিত বাক্সবন্দি স্বপ্নগুলো পূরণের মতো সামর্থ অর্জন করতে পারি। নিজের মতো করে চলতে চাওয়া মানে স্বেচ্ছাচারিতা নয় এই জায়গাটিকে যেমন একজন নারী হিসেবে আমাকে বুঝতে হয় তেমনি আবার এই দায়িত্ববোধের জায়গাটিকে অন্যের কাছে প্রমাণের মতো কোন যৌক্তিকতাও পাইনি কখনও। পাশেই বাড়তে থাকা আমার ভাইটি যদি কোনোদিন স্বাধীনতার প্রশ্নে বাঁধাগ্রস্ত না হয় তাহলে কেন আমার ক্ষেত্রে সেটা জায়েজ হয়ে যাবে? মানি না এসব নিয়ম। আমি একজন নারী কিন্তু একজন দায়িত্ববান মানুষও বটে। আমি বিশ্বাস করি এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ড আমার জন্য অবারিত। কোথাও দুয়ার দেয়া নেই আর এজন্যই আমি ছুঁতে চাই সবকিছুকে। প্রাণভরে নিঃশ্বাস নিতে চাই এই খোলা আকাশের নিচে ঠিক আমি যেমনটা চাই।

যোগ্যতার জায়গায় একবিন্দু ছাড় দেয়ার অবকাশ নেই। প্রতিযোগিতামূলক এই বাজারে কিছু অর্জন করতে চাইলে অবশ্যই একটি মারাত্মক প্রতিযোগিতার মাঝ দিয়েই আমাকেও আসতে হবে এটাই সত্য আর আমিও চাই না কেউ আমাকে নারী বলে দয়া করুক। যোগ্যতার মাপকাঠিতে এগিয়ে যেতে চাই সর্বক্ষেত্রে। রাজনীতি, অর্থনীতি, সমাজনীতি সবজায়গাতেই সমান যোগ্যতায় নিজের জায়গাটিকে দেখতে চাওয়ার অধিকার যেমন একজন পুরুষের আছে তেমনি একজন নারীরও কম নয়।

আমাদের প্রতিটা মানুষেরই অসুখ বিসুখ হয় আর হলে সেখানে দরকার সঠিক চিকিৎসা এটাও সবাই জানি। তবে একটু ভেবে দেখুনতো পাঠক, আমাদের পরিবারের নারী সদস্যটি যখন অসুস্থ হোন তখন কি প্রথমেই তাকে ডাক্তারের কাছে নিয়ে যাওয়ার উদ্যোগ নেয়া হয়? আবার নারী সদস্যটিও কিন্তু নিজের অসুখের কথা নিজের মধ্যেই চেপে রাখে। এই যে চেপে রাখার অভ্যাস এটি কি একজন নারী ইচ্ছা করেই করেছেন? না। এটিও এই সমাজই নারীকে শিখিয়ে দেয়। নারীর অসুখের কথা সবসময় প্রকাশ করতে নেই। একদম মারাত্মক কিছু না হলে এই নিয়ে কেউ আলোচনাও করতে চান না। যত অসুস্থতাই থাকুক না কেন সংসারের সকল কাজই সম্পন্ন করতে হয় তাকেই।

কেবল কি শারীরিক অসুস্থতা? নারীর মানসিক স্বাস্থ্যের কথা নিয়ে আলোচনা করা যেন অনেকটাই গর্হিত অপরাধ। একজন নারী যেন রোবট। তার কোন ভালো লাগা বা মন্দ লাগা থাকতে নেই। কোন ঘটনাতেই সে যেন কষ্ট পেতে পারে না। কষ্ট পেলেও চালিয়ে যেতে হবে নৈমত্তিক কাজের ঘানি।

সমাজ বা পরিবার যখন এতটাই নির্দয় তখন ভাবতে হবে আমাকে নিজেকেই। কেন নয়? কেন ভাববে না বলেনতো। আমি নারী, আমি মানুষও। আর মানুষেরইতো মন খারাপ হয়, ডিপ্রেশন হয়। অসুস্থতা আসে। তাহলে কেন আমি আমাকে নিয়ে টেনশন করবো না বা প্রয়োজনে নিজের যত্নের ব্যবস্থা নিজে করবো না?

দুনিয়া এগুলেও নারীকে কেন্দ্র করে চিন্তাভাবনার খুব একটা পরিবর্তন আসেনি এখনও। আমাদের নারীরা মন খারাপ হলে বড়জোড় একা বসে এক কোনে কাঁদতে বসে। এই কান্নাও আবার কারও সামনে করা যাবে না। হাজারো প্রশ্ন এসে জর্জরিত করে দিবে।

স্বার্থপর হতে শিখতে হবে একজন নারীকে। স্বামী, সন্তান, পরিবারকে অস্বীকার না করেও নিজের সম্পর্কে ভাবা যায় এবং ভাবতে হবেই। নিজেকে নিয়ে ভাবনায় কোন অন্যায় নেই বরং আছে আনন্দ। আমার জীবন তাই ভাবনাটাও আমারই হবে। আমি আমাকে যেমন করে চাইবো তেমন করেই ভাবতে ভালোবাসবো। এই জায়গাটি কেউ করে দিতে পারবে না। পাশে থাকা মানুষটিও একটা সময় অচেনা হয়ে যায় এই চাওয়া পাওয়ার হিসেবে গিয়ে। কষ্ট পাওয়ার কিছু নেই। দায়িত্বের জায়গাটি নিজের মতো করেই পালন করার মতো স্বাধীন চিন্তার অধিকারী হতে হবে।

আর সেজন্যই প্রয়োজন নিজেকে আগে চিনে নেয়া। চাওয়া পাওয়াগুলোকে স্বার্থপরের মতো গুছিয়ে নিয়ে পরিকল্পনার ছকটি এঁকে নেয়া। এখানে অন্য কারও উপর নির্ভর করা মানেই ঠকার সম্ভাবনাকে আমন্ত্রণ জানানো। নারীরাও সমান দায়িত্ববান মানুষ এ কথাটিকে প্রতিষ্ঠার জায়গায় ছাড় দেয়া যাবে না এক বিন্দু। একজন নারী একজন সফল অর্গানাইজারও হতে পারে এমন উদাহরণও তৈরি হচ্ছে আমাদের সমাজে। যদি উৎসাহ নিতে হয় তবে নিতে হবে আরেকজন সফল ও স্বাধীন নারীর কর্ম থেকে। প্রেরণা নেয়া আর কপি করা এক বিষয় নয়। মাথায় রাখতে হবে এটিও। প্রতিটা মানুষ ইউনিক এবং সবার প্রয়োজন ও পরিকল্পনায় আছে পার্থক্যও। সবকিছুকে ছাড়িয়ে সবচেয়ে বড় 'শিক্ষক' ও 'অনুকরণীয়' চ্যাপ্টারটির নাম 'জীবন'। একজন মানুষ তার জীবন থেকে যা শিখে তেমন শিক্ষা আর কেউ দিতে পারবে না। তাই চিন্তার কাঠামোটিকে সাজাতে হবে নিজের জীবনকে কেন্দ্র করে। কী চাই, কেন চাই, কেমন করে চাই এই জায়গাগুলোকে বুঝতে হবে জীবনের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা থেকেই। এবং পরবর্তীতে এই 'চাই'কে কীভাবে 'পাওয়ায়' পরিণত করা যাবে এই কৌশলটির সবচেয়ে বড় গাইডবই হচ্ছে জীবন। আর এই জীবন নিয়েই আমাদের নারীরা ভীষণ রকম উদাসীন। তারা 'জীবন' নামক চ্যাপ্টারের দিকে কখনই ফিরে তাকায়না।

আর সেজন্যই আমি বলতে চাই, আমাদের নারীসমাজকে ফিরতে হবে এই 'জীবন' বইটির দিকেই। নিজের জীবনকে আগে বুঝে নিতে হবে। শুনতে হবে নিজের মনের কান্নাকে। গুমড়ে মরতে দেয়া যাবে না। কান্নাকে হাসিতে রূপান্তরিত করার জন্য সচেতনভাবে জেগে উঠতে হবে নিজেকেই।

আজ থেকে বহু বছর আগে আমাদের জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলাম বলে গিয়েছিলেন, 'জাগো নারী জাগো বহ্নিশিখা' কিন্তু আজও কি আমাদের নারীরা সামগ্রিকভাবে জেগে উঠেছে? সেই জায়গাটিতেই নাড়া দেবার সময় এসেছে নারীদের।